কমপিটিশন

(গল্পগ্রন্থ – অসাধারণ)

শিবশঙ্কর সকালে উঠেই দু দফা ফোন করলেন। একবার অ্যাটর্নি রায় ও মিত্রের জীবনধন রায়কে ও আর একবার প্রসন্নদাস বড়ালের অংশীদার ও কর্তা হরিদাস বড়ালকে, কারণ ওদের আপিস এখনো খোলেনি।

—নমস্কার, কি করব ?

—আসুন একবার। কতদূর করলেন ?

—আসব এখন।

—এখানেই চা খাবেন।

একটু পরে বাড়ির বাইরে মোটরের শব্দ শোনা গেল এবং জীবনধন রায় ঘরে ঢুকলেন। জীবনধন রায়ের পরনে সাহেবি পোশাক, চোখে স্টীলের ফ্রেমের চশমা, পায়ে পেটেন্ট চামড়ার চকচকে বুট, বগলে ফোলিও ব্যাগ।

—আসুন, মি. রায়, বসুন। নমস্কার।

—নমস্কার।

—ওরে, চা নিয়ে আয়। তারপর ?

—তৈরি। সরেজমিনে তদারক করবেন না ?

—রেজেস্ট্রি আপিস সার্চের রেজাল্ট কি ?

—ভালো। দাগী মাল নয়, তবে দেড়—দেড়ের কমে হবে না। আমাদের তিন পার্সেন্ট।

শিবশঙ্করবাবু হরিশ মুখুজ্যের স্ট্রীটে তিনতলা বড় বাড়ি কিনচেন এঁদের দালালিতে। দেড়লক্ষ টাকা দাম, অ্যাটর্নিরা তিন পার্সেন্ট কমিশন নেবেন—আসল কথা হচ্ছে এই।...রুপোর ট্রে করে টোস্ট, ডিমসেদ্ধ, আলুসেদ্ধ ও লেটুসসেদ্ধ এল, তার সঙ্গে চায়ের লিকার, দুধ চিনি আলাদা।

শিবশঙ্করবাবু বললেন—মিষ্টি দিইনি—কারণ আমাদের এ বয়সে—

—না না, থাক। তারপর আমার গাড়ি রেডি, চলুন একবার সরেজমিনে। জিনিসটা দেখুন।

—বেডরুম কতগুলো ?

—উনিশটা রুম সবসুদ্ধ ওপরে নিচে। ছটা বাথরুম, এ বাদে বাইরে তিনটে আলাদা পাইখানা। খুব ভালো বাড়ি। কুণ্ডু কোম্পানিকে রাজী করাতে বেগ পেতে হয়েছে খুব। বুড়ো একেবারে বেঁকে বসেছিল শেষকালে।

—এখন যেতে পারব না—মাপ করুন। এখন বেলা দশটা পর্যন্ত মরবার ফুরসত নেই—এখুনি আবার লোক আসবে—

—আচ্ছা উঠি তাহলে। ওবেলা আপিসে ফোন করবেন এখন—ওখান থেকে যাওয়া যাবে।

একটু পরে হরিদাস বড়ালকে আবার ফোন করা হল।

—নমস্কার, কি খবর ?হ্যাঁ, একবার করেছিলাম—হ্যাঁ—এই আধ ঘণ্টা আগে। হ্যাঁ, সোনাটার কি হল ?বারের দাম কত বললেন ?তিন আনা ?আমার চাই কিছু—হ্যাঁ—হ্যাঁ— হ্যাঁ—আচ্ছা। আজ ?—হ্যাঁ—আচ্ছা। আপিসে ?আচ্ছা।

সাধারণ লোকে এ কথাবার্তা থেকে বিশেষ কিছু বুঝবে না, কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর ‘বড়াল বার’ নামক বিখ্যাত সুবর্ণের বাট কিনবার পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ক্রয়-বিক্রয়ের পালা শেষ হতেই শিবশঙ্করের আপিস ম্যানেজার ও তদারককার মি. ঘোষাল ঢুকে শিবশঙ্করকে খানিকটা মাথা নিচু হয়ে নমস্কার জানিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন। দুজনের মধ্যে যে কথাবার্তা

শুরু হল তা স্কোয়ার ফুট রেট, পার্সেন্ট, ইস্পাতের জালতি, সিমেন্ট, এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম, গ্যারিসন্ এনজিনিয়ার প্রভৃতি শব্দে পরিপূর্ণ ও কণ্টকিত। আজই মি. ঘোষালকে আপিসের কাজে তেজপুর যেতে হচ্ছে, ফোনে এখুনি আসাম মেলে বার্থ রিজার্ভ সম্বন্ধে শেয়ালদা স্টেশনের কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হল। অন্য অন্য কথার পরে বেলা ন'টার সময়ে মি. ঘোষাল বললেন—তা হলে আমি উঠি—

—কত টাকার দরকার ?

—সতেরো হাজার তো ওদের পেমেন্ট করতে হবে, আর পুজোর ব্যবস্থা—তাও তিন হাজার নেবে সুপারিন্টেন্ডেন্ট, হাজারখানেক দিতে হবে উপদেবতাদের। মিসেস বর্মনকে একটা প্রেজেন্ট দিতে হবে ভালো দেখে। কি দেওয়া যায়, স্যার, আপনিই বলুন ?

—একটা জড়োয়ার কিছু দাও গিয়ে—হাজারখানেকের মধ্যে। বিশ হাজারের একটা চেক নিয়ে যাও—

—আজ্ঞে স্যার, ব্যাঙ্কে টাকা ভাঙানোর আমার সুবিধে হবে না। একটায় আসাম মেল। তার আগে আমার অনেক কাজ। একবার আপিসে যেতে হবে। ড্রয়ারের মধ্যে কাগজপত্র রয়েচে, নিয়ে যেতে হবে। গহনাই বা কিনব কখন ?

—আচ্ছা গহনার জন্যে আমি সুরেশকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বদ্রিদাসের বাড়ি। যদি কিছু ভালো থাকে দেখে আসুক। সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি এখান থেকে বাড়ি যাও—নেয়ে খেয়ে গাড়ি নিয়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে আগে চেক ভাঙাও। ওখান থেকে ইস্টিশানে চলে যাও—গহনা যদি পাই সুরেশকে দিয়ে ট্রেনে পাঠাব। মিসেস বর্মনকে খুশি রাখা চাই মোটের ওপর। দেবতাকে তুষ্ট রাখতে হলে দেবীর পূজা না দিলে হয় না। কমপিটিশনের বাজার, বুঝে কাজ করবে।

ডাক এল। একগাদা চিঠি। হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি একবার দেখে নিতে নিতে শিবশঙ্কর ডেকে বললেন—ও রিতুয়া, নিয়ে যা—বড় বউমার চিঠি, নিয়ে যা—সুলেখার—ছোট বউমার—ওপরে দিগে যা। আর শোন—বলে আয় আমি চান করব এখুনি।

খাবার ঘরে বড় পুত্রবধূ নন্দা ভাত নিয়ে এল টেবিলে। ছোট বাটিতে কাঁচামুগের ডাল, বে-মশলার মৌরলা মাছের ঝোল আর কাগজিলেবু কাটা পৃথক ডিশে। সামান্য একটু ঘরেপাতা দই শ্বেতপাথরের বাটিতে। শিবশঙ্কর খেয়ে হজম করতে পারেন না, লিভারের রুগী। পুত্রবধূ বললে—ও বেলা কখন ফিরবেন বাবা ?

—তাকি বলতে পারি কখন ফিরব ?নানা কাজ। তারপর আজ অ্যাটর্নির সঙ্গে গুরুতর কাজ রয়েচে। কেন ?

পুত্রবধূ হেসে বললে—আমরা ভাবচি বেহালা যাব পিকনিক করতে। গাড়িখানার দরকার ছিল—

—ও। তা—কটার সময় যাবে ?গাড়ি না হয় শোভা সিং আপিস থেকে নিয়ে আসবে এখন। তোমাদের পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। আসবার সময় তোমরা ট্যাক্সিতে এসো। পৌঁছে গাড়ি ছেড়ে দিয়ো—বিমান কোথায় ?ওপরে আছে ?

পুত্রবধূ মুখ নত করে বললে—তা তো জানি নে বাবা।

—তার মানে ?বেরিয়েছে ?

পুত্রবধূ পায়ের নখে মাটি খুঁটতে খুঁটতে সেদিকে চেয়ে থেকে উত্তর দিলে—উনি কাল রাত্তিরে তো বাড়ি আসেননি !

—সে কি কথা ?কালও আবার আসেনি—হুঁ—

শিবশঙ্কর ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, আর কিছু বললেন না।

বেলা একটা। শিবশঙ্করের আপিস বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে। বেশি বড় আপিস নয়। জন আট নয় কেরানী বিবিধ খাতা নিয়ে ব্যস্ত। একজন ছোকরা টাইপরাইটারে ঠকঠক টাইপ করচে। শিবশঙ্করকে আপিসে ঢুকতে দেখে সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সন্ত্রস্ত হবার কথা।

দেখতে আপিস ছোট হোক, কিছুদিন আগে এই আপিসে বসেই শিবশঙ্কর সরকার চালের কারবারে কম করেও সাত লক্ষ টাকা মুনাফা পেয়েচেন। তেরশ' পঞ্চাশ সালে দুর্ভিক্ষের বছর। তেরোসিকে দরে ধানের মণ কিনে সাড়ে ষোলো টাকা মণ দরে ধান বিক্রি করেন। চালের কনট্রাক্ট নিয়ে এক হাজার টন চাল খরিদ করেন ত্রিপুরা জেলা থেকে। তারপর সে দেশে চালের দর উঠেগেল চল্লিশ টাকা মণ।

ভালো কাজ করেননি তা নয়। দেশের বাড়িতে প্রায় দু হাজার লোককে ফেন-ভাতের খিচুড়ি খাইয়েচেন, কাপড় বিতরণ করেচেন কত লোককে। সম্প্রতি দুটি মিলিটারি কনট্রাক্টের কাজে শিবশঙ্কর অনেক টাকা রোজগার করেচেন। দুহাতে ঘুষ বিলিয়েও ছ লক্ষ টাকা ঘরে এনেচেন। এ বাদে খুচরো কারবার তাঁর অনেক রকম আছে, এই ছোট আপিসটাতে বসে সারা বাজারের গুপ্ত খবর রাখচেন। টেলিফোনের বিরাম বিশ্রাম নেই এক মিনিট। বাজারে তাঁর বহু চর সর্বদা ঘোরাঘুরি করচে, শেয়ার মার্কেট থেকে সর্ষে পর্যন্ত কোনো বাজারের গুপ্ত খবর ওদের জানতে বাকি নেই।

মোটের উপর শিবশঙ্করের দিন যাচ্ছে ভালো, ধুলো-মুঠো ধরলে সোনা-মুঠো হচ্ছে। আর কি অসম্ভব খাটিয়ে লোক শিবশঙ্কর। চরকির মতো ঘুরচেন এখানে ওখানে, এ আপিস ও আপিস, কত লোকের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করচেন, কত লোক তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করচে—যে লোক এমনি নরম হয় না, তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করে অগ্রসর হতে হচ্ছে, ছুঁচ যেখানে গলে না, সেখানে হাতি গলিয়ে দিচ্ছেন শিবশঙ্কর,—পয়সা কি অমনি হয় ?

শিবশঙ্করের অভিজ্ঞতা এই যে, অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে দয়ামায়া চক্ষুলজ্জা ইত্যাদি দুর্বলতা। যে বিচক্ষণ কারবারি সে এ সব মানবে না। কমপিটিশনের বাজার, চক্ষুলজ্জা এখানে খাটে না।

আর একটা অভিজ্ঞতা, অবিশ্যি বড় মূল্যবান অভিজ্ঞতা যে ঘুষ অসাধ্যসাধন করতে পারে। শিবশঙ্করবাবু বলেই থাকেন—ওহে এমন লোক দেখলাম না যে পুজো পেলে খেতে চায় না। তবে বেশি আর কম। কেউ চায় ষোড়শোপচারে পুজো, কারো বা চাল-কলা, কারো চিনিরনৈবিদ্যি—ঢের ঢের দেখলাম হে, যেখানে ভেবেচি এর কাছে কেমন করে যাব, এত বড় পদস্থ লোক...পুজো দাও, বাস, সব ঠিক। সবাই সমান, তবে ওই যে বললাম, বেশি আর কম। চুরি করার সুবিধে জোটেনি যার, সেই সাধু।

বেলা একটার সময় একটি রোগা, দীর্ঘ চেহারার সাহেবি পোশাকপরা লোক শিবশঙ্করের আপিসে এসে ঢুকল।

শিবশঙ্কর বললেন—কি খবর ?আসুন, বসুন।

—বড্ড বেশি চায়।

—কত ?

—সাড়ে পাঁচ করে কাঠা।

শিবশঙ্কর বিস্ময়ের সুরে বললেন—জমি কার ?ব্যাঙ্কের ?

—আজ্ঞে না, মাগনলাল মুখনলাল ক্ষেত্রীর। একবার মর্টগেজ আছে। রেজিষ্ট্রি আপিস সার্চ করা হয়েচে।

—বড় বেশি দর বলছে না ?

—ও অঞ্চলে ওর কম দর নেই। এর পরে সাত পর্যন্ত উঠবে। ন কাঠা একসঙ্গে আর পাওয়া যায় না স্যার। আপনি কাল নিজে একবার চলুন—বায়নাপত্তর রেজিস্ট্রি না করলে দু-তিনটে খদ্দেরমুখিয়ে রয়েচে।

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। অল্প খানিকক্ষণ কথা বলে শিবশঙ্কর ফোন রেখে সামনের লোকটিকে বললেন—অ্যাটর্নির আপিস থেকে বলচে হরিশ মুখুজ্যের স্ট্রীটের বাড়িটা এখুনি দেখতে যেতে হবে। চলুন না, বাড়িটাদেখে আসবেন—

উভয়ে মোটরে বার হয়ে সোজা হরিশ মুখুজ্যে স্ট্রীটে সেই নম্বরের বাড়ির সামনে এসে দেখলেন মি. ঘোষাল তাঁদের পূর্বেই সেখানে মোটর থামিয়ে অপেক্ষা করচেন।

বাড়ির ওপরের নিচের সব ঘর, বাথরুম, দরদালান, ছাদ সব ঘুরে দেখা হল। মি. ঘোষাল বললেন—মতামত দিন মি. সরকার !

—মতামত আর কি, নেওয়া হবে।

—তিন পার্সেন্টের কথা স্মরণ রাখবেন। ও আমাদের একটা শর্ত। নয়তো আমারই হাতে দুটো খদ্দের। আপনি ক্রেতা, আপনার কাছ থেকে কমিশন নেওয়া নিয়ম নয় জানি—কিন্তু এখানে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা—

—সে যা হয় হবে। ইলেকট্রিক ইনস্টলেশন নেই কেন ?অত বড় বাড়ি—

—ছিল। ওয়ারিং করে নিতে যা খরচ পড়বে তা তো আপনি এমনি বাদ পাচ্চেন। ওই বাড়ি কি দুইয়ের কমে হয়—চার লক্ষ সত্তর হাজার পঁচাত্তর হাজার তো উইদাউট এনি ডাউট ! আপনি বলুন, এখুনি এক মাড়োয়ারি খদ্দের—

—না, না, সে কথা বলিনি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

শিবশঙ্কর একাই আপিসে ফিরলেন, তখন বেলা পৌনে তিন।

আপিসের চাকর কারুয়া বললে—হুজুর, টেলিফোন দুবার বাজিয়েছে। হামি লম্বর লিয়ে রাখিয়েসে।

—কই নম্বর ?

—হুজুরের ঘরের টেবিলমে আছে। মনুবাবুকে দিয়ে লিখিয়ে রাখিয়েসে। এক তো সাউথ ওয়ান ফাইভ—

শিবশঙ্কর চাকরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—আচ্ছা আচ্ছা, তুই যা—এক পেয়ালা চা জলদি তৈরি কর—

—আউর কুছ্ বাবু ?

—আজ বাড়ি থেকে টিফিন আনেনি কেউ ?ফল-টল ?

—না হুজুর। সড়া পোচা দু আপেল টেবিলমে ছিল, ও হামি ফেকিয়ে দিয়েসে—ও কালওয়ালা—

—বেশ করিচিস। যা চা নিয়ে আয়—

কারুয়া অনেক দিনের চাকর, আগে শিবশঙ্করের বাড়িতে ছিল, এখন কাজকর্মের সুবিধের জন্যে ওকে আপিসে নিজের খাসকামরার চাকর রেখেচেন শিবশঙ্কর। শিবশঙ্কর কি খান না খান, কি তাঁর অভ্যেস, কারুয়া এ সব জানে। কারুয়ার আনীত চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে শিবশঙ্করবাবু ভাবছিলেন আরো কিছু জমির সন্ধান নিতে হবে।

জমি বড় দরকার।

এই সব অঞ্চলে বড় বড় প্লটের সন্ধানে আছেন।

শিবশঙ্কর কাগজে-কলমে ছোট্ট একটু হিসেব করে নিলেন। লাখ দুই টাকার জমি কিনে রাখতে হবে। টালিগঞ্জের দিকে কিছু জমি এখনো আছে। ব্যাঙ্কের জমি কিছু আছে লেক আর ঢাকুরে যাদবপুর অঞ্চলে।

'টাকা হলে মাটি করো' মস্ত বড় কথা। অত বড় ইনভেস্টমেন্ট নেই টাকার। দালালেরা নানারকম সন্ধান নিয়ে আসে। তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে আছে জমিজমা-সংক্রান্ত নানা রকম খবর, দালালদের দেওয়া। শিবশঙ্করবাবু ড্রয়ার খুলে অর্ধ-অন্যমনস্কভাবে সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেন। মেদিনীপুর জেলায় শালের জঙ্গল একশো কুড়ি বিঘে এক প্লটে। ধানের জমি ওই সাথে এক প্লটে সত্তর বিঘে, মাঝখানে বড় পুকুর।

বর্ধমান জেলায় ধানের জমি নব্বুই বিঘে। বনপাশ স্টেশনের কাছে।

কুমারডি কয়লাখনির এক-তৃতীয়াংশের মালিকানা-স্বত্ব, বড় বাংলোঘর, ইঁদারা, ছোট বাগান একত্রে।

রানাঘাট টাউনে রেলের নিকট স্টেশন রোডের ওপর দুখানা বাড়ি, রেলের ওপারে বাইশ বিঘের বেগুনবাগান, ইঁটের ভাঁটা।

যশোর জেলায় মৌজা ধরমপুর ও মৌজা চণ্ডীরামপুর—দুইটি বড় মৌজা নীলামে উঠেচে। সামনের মাসের বারোই তারিখে যশোর সদরে নীলাম হবে। লোক পাঠিয়ে শিবশঙ্কর জেনেচেন মৌজার আদায় ভালো, একাত্তরটি জমার মধ্যে উনিশটি খাস হয়ে গিয়েচে এবং আশা আছে আরো আটটি জমা এই বছরের মধ্যেই খাস হবে। বাকি খাজনা পড়ে আছে প্রজাদের কাছে কয়েক হাজার টাকা।

হাজারিবাগ জেলায় সিংজানি-ভোজুড়ি অভ্রের খনি ও শালবন, বাংলো, ইঁদারা এবং কিছু ধানের জমি।

উল্টোডিঙির খাল ধার থেকে সামান্য দূরে ৺মহেশচন্দ্র সিমলাইয়ের বাগানবাড়ি ও পুকুর-বাগানে জমির পরিমাণ দশ বিঘে। কলমের আম, লিচু, ফলসা, ম্যাঙ্গোস্টিন প্রভৃতি ফলের গাছ। দোতলা বাড়ি।

অভ্রের খনির ওপর ঝোঁক বেশি শিবশঙ্করের। দু-পার্সেন্টের অনেক বেশি আসবে টাকার ওপর। স্বাস্থ্যকর স্থান, মাঝে মাঝে গিয়ে থাকাও যাবে, কলকাতায় তো যা খান হজম হয় না, লিভারের রোগে কষ্ট পাচ্ছেন।

আর বাকি সব পাড়াগেঁয়ে জমিজমা, ধানক্ষেত—নাঃ, ওদের কি মূল্য আছে ?জমি কিনতে গেলে কলকাতায়। কলকাতার সম্পত্তির মতো সম্পত্তি নেই—বাড়ি বা জমি। মহেশ সিমলাইয়ের বাগানবাড়ি ভালো, ফলবান গাছ অনেকগুলো, নার্সারি করবার জন্যে কেউ ভাড়া নিতে পারে, অনেকখানি জমি—মূল্যবান সম্পত্তি হয়ে উঠতে পারে দু চার বছর পরে। দালালে বলচে আটষট্টি হাজার, তিনি বলচেন পঞ্চাশ হাজার। যদি ওটা হয়, তবে খুবই ভালো।

শিবশঙ্কর ফেঁপে উঠলেন তো সেদিন। ক'বছরের কথা আর ?কি ছিল শিবশঙ্করের ?বারাসাতের কাছে ভবনহাটি বিষ্ণুপুর, ক্ষুদ্র গ্রাম, সেখানেই পৈতৃক বাড়ি। অবিশ্যি নিতান্ত গরিব ছিলেন না, সেকেলে বড় গৃহস্থ, তবে ইদানীং নামেই ছিল তালপুকুর, ঘটি ডুবত না।

নিজের বুদ্ধিতে শিবশঙ্কর সব করেচেন। বীরের মতো করেচেন, বীরের মতোই ভোগ করে যাচ্ছেন শিবশঙ্কর। এখনো হয়নি, লেক অঞ্চলে বড় একখানা বাড়ি করবার শখ তাঁর, কিন্তু পছন্দসইজমি পাচ্ছেন না।

তেজপুরের কাজটা যদি হাতে এসে যায়, তবে নির্ঘাত তিন লক্ষ ঘরে আসবে। হিসেব করে দেখা আছে তাঁর। এই বছরের শেষেই টাকাটা হাতে আসতে পারে, যদি বিলের টাকা গভর্নমেন্ট এ বছরেই শোধ করে। পুজো দিলে শেষের ব্যবস্থা চটপট হয়ে যাবে। শিবশঙ্করকে কাজ শেখাতে হবে না, ঘুঘু হয়ে বসে আছেন তিনি ! অনেস্টি বলে জিনিস নেই এ বাজারে। অনেস্টি একটা মুখের কথা মাত্র। কমপিটিশনের বাজার, অনেস্টিতে হয় না। টাকা...টাকা...চাই টাকা। দুনিয়াতে টাকা ছাড়া আর কিছু নেই। টাকা যে পথে আসে আসুক। টাকা রোজগারের এই তো সময়। যুদ্ধের বাজারে যে যা করে নিতে পারে। কলকাতার হাওয়ায় টাকা উড়চে...যার বুদ্ধি আছে ধরে নাও। কিছুই এখনো রোজগার করা হয়নি। অনেক কিছুই বাকি।

কেবল একটা ব্যাপার শিবশঙ্করকে বড় চিন্তিত করে তুলেচে।

বড় ছেলে বিমান প্রায়ই রাত্রে বাড়ি আসে না। নিজেরআলাদা একখানা মোটর কিনেচে। নানা রকম কথা কানে গিয়েচে শিবশঙ্করের। ঠিক বুঝতে পারচেন না এখনো তিনি। বিমান এমন ছিল না। বড় বউমা প্রায়ই কাঁদেন, সুলেখার মুখে শুনতে পান তিনি। গিন্নি কিছু বলেন না, এজন্যে গিন্নির ওপর শিবশঙ্কর সন্তুষ্ট নন। গিন্নির প্রশ্রয় না পেলে বিমান এমন হতে পারত না। যত নির্বোধ নিয়ে হয়েচে তাঁর সংসার !

টেলিফোন বেজে উঠে শিবশঙ্করের চিন্তাজাল ছিন্ন করে দিলে।—হ্যাঁ, কে ?ও আচ্ছা—বেশ, বেশ। তুমি চলেই এসো এখানে। দেরি করো না।

একটি শৌখিন বাবুমতো লোক, চোখে সোনাবাঁধানো চশমা, ঘরে ঢুকল দশ মিনিট পরে। এই লোকটি ঘরে ঢোকবার পরে শিবশঙ্কর সতর্ক দৃষ্টিতে ঘরের দরজার দিকে দু-তিনবার চাইলেন। লোকটি চাপা মৃদুস্বরে মিনিট দশেক কথা বলে, তারপর হঠাৎ স্বাভাবিক সুরে ফিরে এসে বললে—বেশ, যাই তা হলে !

—বোসো, বোসো—

বুঝতে পারলে না ?সামনে রাখতে বলিগে যাই ! সিনেমায় আজকাল নাম করে উঠেচে ঠেলে, দেখতে পরমা রূপসী—মৌমাছির ঝাঁক কম নয়। বুঝতে পারলে না ?ঠিক আটটাতে—

বেলা ছটার পরে শিবশঙ্কর ড্রাইভারকে ডেকে বলে দিলেন—শোভা সিং, চলা যাও বেহালামে। বউমাদের লে আও। হাম ট্যাক্সিমে যায়েঙ্গে। ঠিক করে লে আও, যেন মিলিটারি গাড়িমে ধাক্কা মাৎ লাগে—

—বহুৎ আচ্ছা হুজুর—বলে শোভা সিং গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত আপিসে নানা কাজ সেরে সাড়ে সাতটার সময় শিবশঙ্কর ট্যাক্সি নিয়ে বার হলেন। ভবানীপুরের একটা ছোট গলির মধ্যে গাড়ি ঢুকল। আগের শৌখিন লোকটি বারান্দা থেকেনেমে এসে বলল—এসো ভায়া এসো—চা খাবে না ?

—আর এখন চা নয়। চলো—

—এখনো দেরি আছে। আমি কাপড় পরেনি। আসচি—

দুজনে আবার গাড়ি নিয়ে চললেন—বেলতলা রোর্ডের পার্কের কাছাকাছি একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। দুজনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। লোকটি বললে—আমি ফোন করেছিলুম, আটটার সময় সব সরিয়ে দিয়ো। খুব সুন্দরী, আর বয়েস উনিশের বেশি নয়।নিজের চোখেই দ্যাখো ভায়া, এ শর্মার নাম গোপাল চক্কোত্তি। মাসে চারশোতেই রাজি করিয়ে দেব—তুমি শুধু দেখে যাও,—সিনেমাতে আজকাল নাম কি ! যত সব চ্যাংড়া ছোকরার ভিড় সেই জন্যে—

ওপরে দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর বারান্দা, ফুলের টব সাজানো। অর্কিডের টব ঝুলচে বারান্দার ছাদের প্রান্ত থেকে।

সঙ্গী লোকটি কড়া নাড়তেই ওদিকের দরজা দিয়ে যে তরুণটি সিগারেট মুখে বেরিয়ে এসে পাশের সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেল—শিবশঙ্কর যেন ভূত দেখলেন তাকে দেখে।

শিবশঙ্করের সঙ্গী বললে—ওই দ্যাখো, যত সব ছেলে-ছোকরার মরণ—সিনেমার ইয়ে কিনা ! আসল কমপিটিশন হচ্চে এদের কাছে টাকায়—সে কমপিটিশনে দাঁড়ানো চ্যাংড়াদের কর্ম নয়—ও কি ! দাঁড়ালে যে ?কি হল ?

শিবশঙ্কর ততক্ষণ দম নিলেন।

যে ওদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল সে বিমান, তাঁর ছেলে বিমান।